বৈষম্যের পরিসর হিসেবে শিক্ষাঃ অধিকার থেকে সমদর্শিতা

অরুণ কুমার

১৭ জুলাই, ২০২৩

রিক্সাচালকের সন্তান ইঞ্জিনীয়ারিং-এর প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করেছেন বা কোনও উচ্চশ্রেণীর আমলার পদ অলঙ্কৃত করেছেন, এমন সংবাদ সর্বদাই ভারতের সংবাদ মাধ্যমে উঠে আসে। এই জাতীয় খবর ভারতের সক্রিয় শিক্ষা সেক্টরের সাম্য ও বৈষম্য, দুই অবস্থাকেই তুলে ধরে। সাম্য, কারণ এই ধরনের প্রার্থীর কঠোর পরিশ্রম কাজে এসেছে এবং তাঁদের ও তাঁদের পরিবারের ক্ষমতায়নে সাহায্য করেছে। বৈষম্য, কারণ তাঁরা তাঁদের সম্প্রদায়, জাতি ও শ্রেণীর মধ্যে ব্যতিক্রমীদের প্রতিভূ। তাঁদের সাফল্যের এই রকম চাঞ্চল্যকর প্রতিবেদন শুধুমাত্র বেসরকারী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের প্রক্রিয়া কিভাবে এক নতুন ভারতের স্বপ্নকে নিয়ে ব্যবসা করছে তাকে তুলে ধরে না। এর পাশাপাশি, সেই প্রতিবেদনগুলিতে উচ্চ বেতনের সম্মানজনক চাকরির এক আশ্চর্য জগৎকেও দেখায়, যেখানে একজন দরিদ্র শ্রমিকের সন্তানের প্রবেশাধিকার পাওয়া একটি অত্যন্ত স্বাভাবিক ঘটনা হিসেবে দেখার বদলে খবরের বিষয় হয়ে ওঠে। এই রকম চাঞ্চল্যকরভাবে দেখানর বিষয়টি এমন একটি শিক্ষাব্যবস্থার উপস্থিতির কথা ধরে নেয়, যেখানে সমাজের ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী ও স্তরের ছাত্রছাত্রীদের প্রাপ্ত শিক্ষার মধ্যে বৈষম্য থাকাটাই স্বাভাবিক। ভারতের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা একটি যৌথ ঘটনার সাক্ষী হচ্ছেঃ একদিকে ভারতের সামাজিকভাবে প্রান্তিক জাতি ও শ্রেণীগুলি আরও বেশী করে সরকারী শিক্ষার সুযোগ পাচ্ছে এবং অন্যদিকে, শিক্ষাব্যবস্থাকে সম্পূর্ণভাবে বেসরকারীকরণের প্রচেষ্টা হচ্ছে।

সাশ্রয়ী শিক্ষার পরিসর কমার এবং আসন ও কর্মসংস্থানের সুযোগের জন্য প্রতিযোগিতা বাড়তে থাকার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাক্ষেত্রে ভারতের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসাম্য আরও স্পষ্ট হয়ে উঠছে। এই অসঙ্গতির প্রলম্বিত প্রতিফলন দেখা যায়, যখন সামাজিকভাবে প্রান্তিক পটভূমি থেকে উঠে আসা সফল ছাত্রছাত্রীদের এই শিক্ষাগত ক্ষমতায়নের দাবীদার হিসেবে ধরা হয় না, কারণ সামাজিকভাবে বিত্তবান সহপাঠীদের থেকে তাঁদের জন্মগতভাবে কম "মেধাবী" হিসেবে দেখা হয়। অনেক সময়ই তাঁদের সাফল্যকে তাঁদের সামাজিকভাবে প্রান্তিক প্রেক্ষাপটের কারণে বিশেষ অনুগ্রহ পাওয়ার ফলশ্রুতি হিসেবে দেখা হয়। এই দিক থেকে দেখলে, ভারতের শিক্ষাব্যবস্থা প্রান্তিক ছাত্রছাত্রীদের জন্য একই সঙ্গে বদ্ধ ও উন্মুক্ত।

ঐতিহাসিকভাবে, ভারত তার ঔপনিবেশিক জীবন থেকে অনেকটা দূরে সরে এসেছে; কার্যত বলা যেতে পারে যে, ভারতে ধীরগতিতে একটি শিক্ষাবিপ্লব ঘটে গেছে। আজকের ভারতে শিক্ষিতের সংখ্যা ৭৭ শতাংশের বেশি, যা ১৯৪৭ সালে ভারতের স্বাধীনতার সময় ছিল ১৮.৩ শতাংশের নিচে। ১৯৯০-এর দশকে ভারতকে নিরক্ষরদের দেশ বলে অভিহিত করা হত। এখন এই দেশ একটি চলিষ্ণু শিক্ষাব্যবস্থার কেন্দ্র। তবে, ভারতের সমাজ এখনও চরম আর্থসামাজিক বৈষম্যের দ্বারা চিহ্নিত, যা তার শিক্ষাক্ষেত্রের কৃতিত্বকে খর্ব করে। ভারত থেকে অসংখ্য অসম্ভব ধীমান ও আন্তর্জাতিকভাবে প্রতিষ্ঠিত সফটওয়্যার ইঞ্জিনীয়ার, ডাক্তার এবং পণ্ডিত ব্যক্তি উঠে এসেছেন। একই সঙ্গে, এই দেশেই এমন মানুষও থাকেন যাঁরা কোনও দিন বিদ্যালয়ে পড়াশুনোর সুযোগ পান নি, বই পড়েন নি এবং যাঁদের সন্তানকে বিদ্যালয়ে পাঠানর জন্য লড়াই করে যেতে হয়। জাতীয়তাবাদী বা জাতিপরিচয় কেন্দ্রিক সংগ্রাম – যেদিক থেকেই দেখা হক না কেন, আধুনিক ভারতের শিক্ষা বিষয়ক মহান আখ্যানটিকে, শিক্ষার প্রকৃতিকে প্রশ্ন করার পরিবর্তে, শিক্ষাব্যবস্থার ব্যাপকতর গণতন্ত্রীকরণের আখ্যান হিসেবে উদ্ভাবন করা হয়েছে। তবে, যখন সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে প্রান্তিক ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষাক্ষেত্রে প্রবেশ করেন, তখন তাঁরা শিক্ষা পাওয়ার সমান অধিকারের জন্য লড়াই করেন না। বরং তা হয়ে ওঠে সামাজিক ও

অর্থনৈতিকভাবে বিত্তবান সহপাঠীদের সমতুল্য সুযোগ ও জ্ঞান অর্জনের লড়াই। এই দ্বিতীয় বিষয়টিকে, শিক্ষাজগতের সমস্যা ও নীতিগত উদ্বেগ হিসেবে উপলব্ধি করা এবং স্বীকৃতি দেওয়াই বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার সংশোধনের মূল সূত্র।

সমমানের সুযোগ ও জ্ঞানের সমবন্টনের দাবি করার সময় যে সমস্যাগুলি উঠে আসে, তার মধ্যে কয়েকটি হল ভাষা প্রশিক্ষণ, সাংস্কৃতিক মূলধন, পাঠক্রম অনুসরণ করে শেখার কাজ সম্পূর্ণ করা, পড়াশুনো চালিয়ে যাওয়ার জন্য তার উপযুক্ত সম্পদ ক্রয়ের ক্ষমতা, শ্রেণী ও জাতি পরিচয়গত পার্থক্যের কারণে ছাত্রজীবন সংক্রান্ত অসম অভিজ্ঞতা, স্কুলকলেজের চত্বরে মহিলাদের জন্য পৃথক নিয়ম ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা। শিক্ষার বিষয়ে সমদর্শিতাকে প্রভাবিত করতে সক্ষম সমস্যাগুলি শিক্ষাব্যবস্থাকে যে বৃহত্তর আর্থসামাজিক কাঠামোতে স্থাপন করে তার থেকে আমরা শিক্ষাকে পৃথক করতে পারি না। শিক্ষার মাধ্যমে সমাজ ও অর্থনীতি রূপায়িত হয় এবং শিক্ষাব্যবস্থার অভ্যন্তরে যা ঘটে, তা-ও নির্মিত হয় সমাজ ও অর্থনীতির প্রভাবে। উনবিংশ শতাব্দীর পরের দিকে ও বিংশ শতাব্দীতে যে নিম্নবর্গের শ্রমজীবী শ্রেণীর জন্য রাষ্ট্র, মনিব শ্রেণী, ধর্মীয় সংস্থা এবং সমাজ সংস্কারকরা যে সীমিত শিক্ষাদানের পরিকল্পনা করেছিলেন, সেই উদাহরণটির মাধ্যমে আমি শিক্ষার অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে অধিকার বনাম সমদর্শিতার প্রশ্নটিকে ইতিহাসের নিরিখে বিচার করে দেখতে চাই।

কে কাজ করে? কে পড়ে? মেহনতী মানুষের পুঁথিগত শিক্ষার দাবি

ভারতের শিক্ষা ও শ্রমের ঐতিহাসিকরা অধিকার ও অভিজ্ঞতার দিক থেকে শ্রমজীবী দরিদ্র শ্রেণীর শিক্ষার ইতিহাসটি লিখতে ভুলে গেছেন। ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র ও অভিজাতদের বিষয়ে আলোচনাগুলি ধরে নেয় যে, শ্রমজীবী শ্রেণী এমন একটি অক্ষরজ্ঞানহীন গোষ্ঠী, যারা শিক্ষাসংক্রান্ত প্রকল্পগুলির প্রতি উদাসীন। চিরচরিতভাবে সাংস্কৃতিক অভিজাতশ্রেণী, শিক্ষিত উচ্চবর্ণ ও উচ্চশ্রেণীর জগতের সঙ্গেই বই পড়া, লেখালিখি এবং বিদ্যালয়ে পাঠের অভিজ্ঞতার পৃথিবীটি জড়িত এবং এই পৃথিবীর তুলনায় শ্রমের নিম্নবর্গতা ও প্রান্তিকতাও এই চিত্রটিতে প্রতিফলিত হয়। দক্ষিণ এশিয়াতে ইতিহাস ও শিক্ষা বিষয়ক যে গবেষণা ও আলোচনা, তার অনেকটাই মানসিক শ্রম ও কায়িক শ্রমের এই মৌলিক পার্থক্যের চিত্রটি দ্বারা চিহ্নিত। ঔপনিবেশিক আধিকারিক এবং কর্মচারী ও সমাজের অভিজাতদের লেখাপত্রতে নিম্নবর্গের শ্রমিকশ্রেণীর নিরক্ষরতাকে, আধুনিক অর্থনীতি ও সমাজে এই গোষ্ঠীগুলির অংশগ্রহণের ব্যর্থতা বলে চিহ্নিত করা হয়েছে, যা ১৯৫০ ও ৬০-এর দশকের আধুনিকীকরণ তত্ত্বে বর্ণিত ভারতের অসম্পূর্ণ/অসংলগ্ন আধুনিকীকরণকে ব্যাখ্যা করে। সরকারী নথিতে, ভারতীয় শ্রমিকশ্রেণীর দারিদ্র ও অনগ্রসরতার ন্যায্য কারণ হিসেবে তাঁদের শিক্ষাহীনতা ও অজ্ঞতাকে উল্লেখ করা হয়েছে।

আমরা প্রায় জানতামই না যে, সমস্ত জাতি পরিচয়ের সামাজিক স্তরের সব চেয়ে নিচের তলার শ্রমিক ও সেবাদানকারী শ্রেণীর দিক থেকে শিক্ষার দাবী এবং উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে ঔপনিবেশিক অর্থনীতির অধীনস্থ একটি প্রশিক্ষিত, শৃঙ্খলাবদ্ধ এবং দক্ষ শ্রমশক্তি নির্মাণের ব্যাপকতর দাবীর কারণেই বিভিন্ন ধরনের শিল্প ও প্রায়োগিক শিক্ষার বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা শুরু হয়। যখন বিভিন্ন শিল্প সেক্টর দক্ষ ও শিক্ষিত শ্রমিকের জন্য দাবী জানাতে শুরু করে ও যখন বিভিন্ন অংশীদার (কারখানার মালিক, পরিকাঠামোগত প্রকল্পে আগ্রহী ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র, সমাজ সংস্কারক যাঁরা নাগরিক দরিদ্রশ্রেণীকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করার চেষ্টা করতেন, ধর্মীয় সংগঠন যা প্রান্তবাসীদের শিক্ষিত করার পদক্ষেপ নিতেন) জড়িত হয়ে পড়েন, তখন এই ধরনের বিদ্যালয় বিভিন্ন আকারে, বিভিন্ন জায়গায় অসমভাবে গড়ে উঠতে থাকে। এই রকম বিদ্যালয়ের উদাহরণ হিসেবে শিল্পকেন্দ্রিক কারিগরদের প্রশিক্ষণের জন্য শিল্প ও প্রায়োগিক বিষয়ের বিদ্যালয়, কারখানার সঙ্গে জড়িত শিশুদের শিক্ষার জন্য কারখানা সংলগ্ন বিদ্যালয়, নাগরিক দরিদ্র শ্রেণীর প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য নৈশ বিদ্যালয়, দলিতদের জন্য অন্ত্যজ বিদ্যালয়, কৌলিক পেশা চর্চা করেন এমন কারিগরদের তাঁদের কাজে দক্ষতর করে তোলার জন্য বিদ্যালয়, সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে দরিদ্র গোষ্ঠীর ধর্মান্তরিত ব্যক্তিদের প্রশিক্ষণের জন্য খ্রীস্টান ধর্মপ্রচারকদের প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয় ইত্যাদি। এই

সময় পর্যন্ত, এই বিদ্যালয়গুলি কাজ করত মূলত শ্রমদানকারী জাতি, যাঁরা ভবিষ্যতেও তাঁদের জাতিপরিচয় অনুযায়ী নির্দিষ্ট কাজগুলিই করে যাবেন, তাঁদের মধ্যে। শিক্ষিত ও ঐতিহ্যগত প্রথায় বিদ্যালাভ করেছেন এমন জাতিগুলির জন্য পুঁথিগত শিক্ষার জন্য বিদ্যালয় ও কলেজ, এবং তার পাশাপাশি ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের প্রতিষ্ঠানের মত বেশ কিছু উচ্চতর প্রায়োগিক শিক্ষার প্রতিষ্ঠানও তৈরি করা হয়।

ইউনাইটেড কিংডম, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, আফ্রিকান ও ভারতীয় উপনিবেশ সহ বিভিন্ন শিল্পায়িত সমাজ ও উপনিবেশে উনবিংশ শতাব্দীতে যে আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার উত্থান হয়, তা একদিকে, একটি পেশাদার ও শিক্ষিত শ্রেণী, ও অন্যদিকে, একটি দক্ষ কায়িক শ্রমিক গোষ্ঠী নির্মাণের জন্য পৃথক পৃথক পাঠক্রমের উপর নির্ভর করা হয়। পবিত্রতা ও অপবিত্রতা, কোন জাতি কায়িক শ্রম করবে ও কারা করবে না, কোন জাতি শিক্ষার অধিকারী ও কারা নয়, তার ধারণার উপর ভিত্তি করে জাতিপরিচয় ভিত্তিক অসাম্য এবং জাতিবিদ্বেষ ইতিমধ্যেই ভারতের কর্ম ও শিক্ষার কাঠামোটিকে (নীতিগত ভাবে) প্রভাবিত করেছিল। শিল্পক্ষেত্রে ও সমাজে মানসিক ও কায়িক শ্রমের পুঁজিবাদী পৃথকীকরণ এই স্তরটির সঙ্গে এমনভাবে যুক্ত হয়, যাতে করে শ্রম ও পরিচালনা/দক্ষতার জাতিপরিচয় ভিত্তিক বিভাজন ও পুঁজিবাদী পৃথকীকরণের সীমারেখা অস্পষ্ট হয়ে ওঠে। তাই, ভারতের মানসিক শ্রম ও কায়িক শ্রমের চরিত্রের বিভাজন কেবল জাতিপরিচয়ের উপর নির্ভরশীল নয়, এর সঙ্গে পুঁজিবাদ নির্ভর বিভাজনও অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। এই বিভাজনের প্রকৃতিটিকে শুধুমাত্র পুঁজিবাদ বা শুধুমাত্র পুঁজিবাদ-পূর্ববর্তী পরিচয়ের (পুঁজিবাদে যাদের অপর বলে অভিহিত করা হয়) দ্বারা ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। একটি দক্ষ ও প্রশিক্ষিত শ্রমিকশক্তি নির্মাণের উদ্দেশ্যে, দরিদ্র ও প্রান্তিক গোষ্ঠীর জন্য বিশেষভাবে তৈরি শিক্ষাব্যবস্থাকে একটি শক্তিশালী অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা হয় এবং এই নিম্নবর্গীয় শ্রমিকশ্রেণীকে একটি উৎপাদনশীল শক্তি হিসেবে গড়ে তুলতে ও তাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে, তাদের জন্য পরিকল্পিত শিক্ষাব্যবস্থাকে প্রধানত ব্যবহারিক, প্রায়োগিক, যান্ত্রিক এবং কারখানাকেন্দ্রিকই রাখা হয়।

তাই, ১৮৯৩ সালে, *আজাদ* নামে উত্তর ভারতের একটি আঞ্চলিক ভাষার খবরের কাগজের সম্পাদকীয়তে বলা হয়, "যদি নিম্নবর্ণের মানুষদের শিক্ষাদান করাই হয়, তবে সেই শিক্ষার বিষয় হওয়া উচিত কৃষিকাজ ও উৎপাদনের মূলনীতি, এবং যাতে তারা তাদের এই নবলব্ধ জ্ঞানকে নিজেদের কৌলিক পেশার ক্ষেত্রে কার্যকরভাবে প্রয়োগ করতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে বিশেষ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা উচিত।"

একইভাবে, ১৯১৫ সালে *হার্ভেস্ট ফিল্ড* নামে একটি খ্রিস্টান ধর্মপ্রচারকদের সাময়িক পত্রিকা ধর্মান্তরিত দলিত খ্রিস্টানদের শিক্ষালাভের "সুউচ্চ" স্বপ্ন সম্বন্ধে মন্তব্য করে, "ঐতিহ্যগতভাবে 'পতিত' অবস্থায় জন্মে, শ্রম দান করে ('শিক্ষা'-র থেকে যে শ্রম কোনও রকম সাহায্য পায় না) এমন সর্বনিম্ন শ্রেণী থেকে শুরু করে উচ্চতম শ্রেণী, যাদের প্রধান দুই বিশেষত্ব হল যে তারা 'শিক্ষিত' ও কোনও রকম কায়িক শ্রম করে না, এমন সমস্ত শ্রেণীর দ্বারা নির্মিত সামাজিক সোপানটিতে তাদের সামাজিকভাবে নির্ধারিত স্থানেই প্রবেশাধিকার পায়। ভারতের খ্রিস্টানরা আমেরিকার কালো মানুষদের চেয়েও বেশি করে বুঝেছে যে, একমাত্র শিক্ষাই অক্ষরজ্ঞানহীন ব্যক্তিকে শ্রম থেকে মুক্তি দিতে পারে।"

আজকের ভারতে, সমাজের সমস্ত স্তর থেকেই শিক্ষার জন্য ক্রমশ বেড়ে চলা দাবীকে উপেক্ষা করে, শিক্ষা সেক্টরের যে দ্রুত বেসরকারীকরণ হচ্ছে, তার একদিকে যেমন শিক্ষা সেক্টরকে আরও প্রসারিত করার ক্ষমতা আছে, কিন্তু আরও গুরুত্বপূর্ণভাবে, শিক্ষার পরিসরে যে অসাম্য দেখা যায় তাকে আরও তীব্র করে তোলারও সম্ভাবনা আছে। পড়াশুনোর প্রবল ব্যয়সাধ্যতা এবং এই জনপ্রিয় বিদ্যালয়গুলি যে সব প্রধান নগর ও শহরে অবস্থিত, সেখানে থাকা খাওয়ার জন্য বিপুল খরচের কারণে জাতি ও শ্রেণীপরিচয় অনুযায়ী ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে আরও বিভাজন ঘটছে। যতক্ষণ না পর্যন্ত আমরা স্বীকার করছি যে, শিক্ষাক্ষেত্রগুলি বৈষম্যের নতুন পরিসর নির্মাণ করছে, ততক্ষণ পর্যন্ত তার থেকে যে সমস্যাগুলি উঠে আসে, সেগুলির মুখোমুখি আমরা হতে পারব না। ভারতের শিক্ষাব্যবস্থা সংক্রান্ত বিতর্ককে তাই শিক্ষার অধিকারের বদলে অভিজ্ঞতার সমদর্শিতাকে কেন্দ্র করে হতে হবে।

অরুণ কুমার নটিংহাম বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ঐতিহাসিক এবং বর্তমানে শ্রমজীবী নিম্নবর্গের শিক্ষাসংক্রান্ত অভিজ্ঞতা নিয়ে তিনি তাঁর প্রথম বইটি লিখছেন। তিনি @arunk_patel থেকে ট্যুইট করেন।